বাদল সরকার ও তাঁর নাট্য-দর্শন: মঞ্চ

সৌমাল্য নায়ক

বিষয় সংক্ষেপ

নাটক শুনতে, পড়তে, দেখতে ভালোবাসতেন কিন্তু ভবিষ্যতে নাট্যকার হবেন বলে কখনও ভাবেননি বাদল সরকার। অথচ নাটক নিয়েই তাঁর খ্যাতি বিশ্বময়। এমনকি চাকরি ছেড়েছেন নাট্যভানায় গণ-আন্দোলনকে আরো ছড়িয়ে দিতে। প্রসেনিয়াম মঞ্চের জন্য প্রথমে কমিক নাটক ও অ্যাবসার্ড নাটক লিখলেন ও মঞ্চস্থ করালেন। উদ্দেশ্য পরিস্কার হল, পূরণ হল না। তারপরেই প্রয়োজন বোধ করলেন নতুন মঞ্চের, নতুন ধরনের নাটকের। যার নাম হল থার্ড থিয়েটার। ফার্স্ট থিয়েটার যাত্রা, সেকেণ্ড থিয়েটার প্রসেনিয়ামের সিন্থেসিস। প্রতিটি নাট্য অঙ্গের নাট্য-দর্শন তাঁকে অন্যান্য নাট্যকারের মধ্যে স্বতন্ত্র্য করেছে। মঞ্চের আকার, দর্শক-অভিনেতার সম্পর্ক, তাদের অংশগ্রহণ, আঞ্চলিকতাকে মান্যতা দেওয়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাঁর ভাবনা গবেষণাধর্মী। বিদেশী প্রভাব তিনি তবে অস্বীকার করেন নি। সবে মিলে অঙ্গনমঞ্চ থেকে মুক্তমঞ্চ আকর্ষণীয় হয়ে উঠল সাজসজ্জা, রূপসজ্জা, মঞ্চোপকরণ বাদে এক গণ-জাগরণ মন্ত্রে। দেশ-কাল-পাত্র নিরিখে নাট্য ভাবনার উত্তুঙ্গ ক্রম-পরিণতি-এ ছিল তাঁর প্রাণের তাগিদ।

সূচক শব্দ : *নাট্যদল-বিকল্প-পরিকল্পনা-সিন্থেসিস-থার্ডথিয়েটার - বেড়াভাঙ্গা - অংশগ্রহণ - বিপ্লব - দর্শন - কলাকৌশল - পরিস্থিতিসৃষ্ট - সজীব-মিল-গুরুত্ব-সফলতা।*

কোলকাতায়, ১৯২৫-এ জন্ম। ১৯৪১-এ ম্যাট্রিকুলেশন স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুল থেকে। ১৯৪৬-এ শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে স্নাতক। ১৯৪৭-এ নাগপুরে কর্মজীবন শুরু। ১৯৫২, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সান্ধ্য পাঠ্যক্রমে নগর-পরিকল্পনায় ডিপ্লোমা। ১৯৫৭ তে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে আবারও টাউন প্ল্যানিং-এ ডিপ্লোমা। ১৯৬৪-এ ফ্রান্সে স্কলারশিপ নিয়ে টাউন প্ল্যানিং-এর ব্যবহারিক শিক্ষাগ্রহণ। ১৯৯২-এ শেষ বয়সে তুলনামূলক সাহিত্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ.। ১৯৫৬-তে 'সলিউশন এক্স' তাঁর প্রথম নাটক। নাটক লিখেছেন ৭০-এরও বেশী। একইসঙ্গে তিনি নাটককার, নাট্যকার ও নাট্যতাত্ত্বিক। নাটকের দলও ছিল বেশ কয়েকটি। মুখ্য হল - ১৯৬৭-তে প্রতিষ্ঠিত 'শতাব্দী'। উৎপল দত্ত, মনোজ মিত্র, মোহিত চট্টোপাধ্যায়দের সমসাময়িক ইনি। জীবন-সূর্য অস্তমিত হয় তাঁর ২০১১-তে। ইনি সুধীন্দ্র সরকার। ইনিই 'ভারতবর্ষের নাট্য সমাজের অধীশ্বর' - বাদল সরকার।

বিশ্বযুদ্ধোত্তর ধ্বংসলীলা যাতে আগামীকে অসহায় না করতে পারে তার জন্য বাদল সরকার উদ্বিগ্ন ছিলেন। সেই তীব্র উদ্বিগ্নতা থেকে তাঁর বিকল্প থিয়েটারের খোঁজ। প্রসেনিয়াম ছাড়িয়ে অন্তরের কথা দর্শক-সাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার তাগিদে নাটকে, অভিনয়ে কিছু নতুনত্ব নিয়ে এলেন ১৯৬৯-৭০ নাগাদ। পরে তাঁর দলের কর্মীরা এই নতুন থিয়েটারের নাম দিলেন 'থার্ড থিয়েটার'। বাদল সরকার তা মেনেও নিলেন (১৯৮১ তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে দ্বিজেন্দ্রলাল স্মারক বক্তৃতায়)। বাদল সরকারের এই থার্ড থিয়েটার আধুনিক কবিতার মতই লাফ বা ঝুঁকি সম্পন্ন, আপাত অ্যাবসার্ড, প্রতিবাদধর্মী গভীর দর্শনে সমৃদ্ধ।

তাঁর পেশা ও নেশার সাধারণ মিল হল পরিকল্পনা। নগর পরিকল্পনার সাথে নাটক নিয়েও পরিকল্পনা করতে থাকেন। নাটক

গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়, মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

পরিকল্পনায় এতটাই জোর দিলেন শেষে যে, নগর পরিকল্পনার সময়ই থাকল না অর্থাৎ মানুষের জন্য, নাটকের জন্য, বিদেশী ডিগ্রী সত্ত্বেও চাকরিতে ইস্তফা দিলেন মেয়াদ থাকতে থাকতেই। ইনি বড় হয়েছেন বিশ্বযুদ্ধ ও বিশ্বযুদ্ধোত্তর আবহাওয়ায়। প্রসেনিয়াম মঞ্চেই শুরু হয়েছিল তাঁর নাট্য-ভাবনা। ভাল থিয়েটার করাই ছিল সেখানে মুখ্য লক্ষ্য। একটা উপলব্ধ সত্যকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার ভাবনা এসেছে কিছু পরে। কিছু পরে যোজনা করেছেন নাট্য ভাবনায় নতুন আবেগ। তারপর এগিয়ে গেছেন নিজের দর্শনকে সামনে নিয়ে। তাঁর থার্ড থিয়েটার হল ফার্স্ট থিয়েটার যাত্রা ও সেকেণ্ড থিয়েটার প্রসেনিয়ামের সিন্থেসিস। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের তাগিদেই তিনি এই থিয়েটারের জন্ম দিলেন। দর্শকের ভেতর বোধের জাগরণই তাঁর এই থিয়েটার ভাবনার মূল কথা।

নাটক লেখার জন্য নাটক লেখেননি, থিয়েটার করার জন্যই তিনি নাটক লিখেছিলেন। কমিক নাটক দিয়েই তিনি নাটক লেখা শুরু করেছিলেন। তারপর অ্যাবসার্ড নাটকের প্রথম স্বাদ এনে দিয়েছিলেন বাঙালিকে। এবং ইন্দ্রজিৎ (১৯৬৩), বাকি ইতিহাস (১৯৬৫), পাগলা ঘোড়া (১৯৬৭) প্রভৃতি তাঁর সমাজ সচেতন মনভাবেরই পরিচয় দেয়। প্রথম থেকেই তাঁর মনে এই ভাবনা গড়ে ওঠে যে, স্বার্থপর মানুষগুলো মুখোশধারী তাই বিপদ আরোও তীব্র। স্বার্থপর মানুষগুলোর রক্তে স্বার্থপরতা এতটাই মিশে গেছে যে তাদের পরিবর্তন অসম্ভব বরং সাধারণ মানুষকে সজাগ করায় জোর দেওয়া প্রয়োজন। এরজন্য পথ খোঁজা শুরু করলেন। কুমার রায় যথার্থই বলেছেন- ''আজকের পৃথিবীতে প্রায় সবদেশের থিয়েটারের সামনে একটা চ্যালেঞ্জ এসেছে - সেটা আজকের সময়ের তালটাকে ধরবার। সে তাল যদি না ধরতেই না পারা যায় তবে প্রচলিত প্রথাকে ভাঙ্গবার চেষ্টা তো চলবেই।''[১] বাদল সরকার প্রথা ভেঙে অঙ্গনমঞ্চকেই স্থির করলেন সেই পথ হিসাবে। অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের দোতলার হলঘরে শুরু করলেন তার পথ চলা। প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মঞ্চ ছিল তিনদিক বন্ধ, একদিক খোলা আর তাঁর থার্ড থিয়েটারের অঙ্গনমঞ্চ তো একদিক বন্ধ, তিনদিক খোলা আর মুক্ত মঞ্চ তো মুক্তই। নাটক নিয়ে বাদল সরকারের গবেষণার বিকাশ দর্শক-সাধারণকে সঙ্গে নিয়ে অর্থাৎ ল্যাবরেটরী নামিয়ে এনেছেন তিনি মানুষের মাঝে। তাঁর লক্ষ্য দর্শকের চেতনাস্ফূরণ। বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভাবী ভয়ঙ্করতা যাদের মর্মগোচর হয়নি তাদের জন্যই তিনি নাটককার ও নাট্যকার। বয়ে যাওয়া সময়কে তিনি ধরতে পারবেন না, তবু বিপদের সাইরেন তাঁকে বাজাতে হবে, লড়াইয়ের প্রেরণা তাঁকে দিতে হবে, আন্দোলনের বীজ তাঁকে বুনতে হবে। চার-দেওয়ালের গবেষণাগারে তাই পদ্ধতি বিচারে, নীতি নির্ণয়ে সময় কাটালে চলবে না। গ্রেটোভস্কির সাজসজ্জা, রূপসজ্জা, দৃশ্যসজ্জা এমনকি মঞ্চ ছাড়াই শারীরিক অভিনয় প্রক্রিয়া তো দেখেছেন তিনি, কর্মসূত্রে বিদেশে গিয়ে। কিংবা রিচার্ড শেখনারের কাছে নাটক অভিনয়ের মেথোডলজি আয়ত্ব করেইছেন তিনি। তিনি পাবেন না অভিনয়ের কোর্স করা অভিনেতা - অভিনেত্রী, কালক্ষেপ না করেই নিজের হাতে শিখিয়ে পড়িয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রী তৈরি করেছেন অন্তরের গভীর তাগিদ থেকে, ভারতবাসীকে বিশাল শূন্যের বিরুদ্ধে একা মানুষের লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করতে।

তিনি তিনটি বেড়া ভেঙেছিলেন অঙ্গনমঞ্চে - দূরত্বের বেড়া, স্তরের বেড়া, দর্শকের সঙ্গে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বেড়া। প্রসেনিয়ামে লম্বা হলে যখন দর্শক একদিকে বসত তখন শেষের দর্শকরা থাকত অনেক দূরে আর অঙ্গনমঞ্চ তো তিনদিক খোলা তাই দর্শক বসল তিনদিকে ছড়িয়ে ফলে দূরত্ব গেল তুলনামূলক কমে। প্রসেনিয়াম মঞ্চ ছিল দর্শক আসনের থেকে বেশ উঁচুতে তাই যেন একটা স্তর বিভাজন হয়েছিল নাট্যকর্মীদের সঙ্গে। 'স্পার্টাকুস' (২৮ জানুয়ারী, ১৯৭২) থেকে বাদল সরকার অঙ্গনমঞ্চকে নামিয়ে আনলেন দর্শকাসনের একই মেঝেতে ফলে ঘুচল স্তরের বেড়া। এবার আরও সহজ হল দর্শকের সঙ্গে নট-নটীর যোগাযোগ। যখন অভিনেতা অভিনেত্রীরা দর্শকের মধ্যে এসে অভিনয়ের অংশী করে নিল তাদের তখন ঘুচে গেল আরও একটা

বাঁধা। দর্শকেরও স্কিল বাড়ল। দর্শকের কল্পনা শক্তিকে ব্যবহার করা হল অঙ্গনমঞ্চে। বাদল বাবুর কথায় - ''থিয়েটারের দামি ভারী জিনিসগুলো আর দরকার হচ্ছে না। সেট খাটাবার আর দরকার নেই, তাতে দর্শকের দৃষ্টি আরও ব্যাহত করবে। প্রসেনিয়ামে বার বার বোঝানোর চেষ্টা করা হয় - এটা মঞ্চ নয়, এটা চায়ের দোকান কিংবা শোবার ঘর - এইসব ভোল অঙ্গনমঞ্চে আর দরকর নেই। তার মানে দর্শকের কল্পনাশক্তিকে ব্যবহার করা আরম্ভ হল। একধরনের অর্ডিয়েন্স পার্টিসিপেশন শুরু হল তার কল্পনাশক্তিকে ব্যবহার করতে। তাতে ঐ সেট, স্পটলাইটের জাদুর আর প্রয়োজন হল না বরং প্রয়োজন হল অভিনেতার দেহ ও মনকে ব্যবহার করা।''[২] এবার নাটককে দর্শকের মাঝে এনে উপস্থিত করা গেল, অনেক বেশী অন্তরঙ্গ হওয়া গেল আসল সত্য উপলব্ধিতে। থিয়েটার প্রাকৃতিক অক্সিজেন পেল। বাদল বাবুর ভাবনা কি দারুণ! - ''সিনেমার পরিপ্রেক্ষিতে থিয়েটারের দূরবস্থা আমাকে খুব এফেক্ট করেছিল। মনে হত সিনেমা এত শক্তিশালী মিডিয়াম, কিন্তু থিয়েটারের কি কোনও জোরই নেই যে থিয়েটার লোক টানতে পারে? তখন আমি কোথায় থিয়েটারের বৈশিষ্ট্য সেটা খুঁজে বের করার তাগিদ অনুভব করি। বুঝতে পারি যে থিয়েটার এক জীবন্ত কলামাধ্যম এবং এখানেই তার জোর। এখানে সিনেমা কিছুতেই নকল করতে পারবে না থিয়েটারকে।''[৩] উদ্দেশ্য, থিয়েটারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া নয়, থিয়েটারের মধ্যে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

যে কাজটা তিনি পার্টির মাধ্যমে সরাসরি করতে চেয়েছিলেন সেই কাজ করতে শুরু করলেন থিয়েটারে। ছাত্রজীবনে তিনি বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৯-৫০ নাগাদ কিছু ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনি পার্টি থেকে বেরিয়ে আসেন। পরবর্তীকালে তিনি বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। তাঁর ছিল নো আইডেন্টিফিকেশন। দেখেছেন, সংগঠন নীচ থেকে গঠিত নয়, ওপর থেকে আরোপিত। দেখেছেন, মধ্যবিত্ত নেতারা কিভাবে ওয়ার্কারদের লিডার সাজিয়ে নিজেরাই কোরাপশান করে নেপথ্যে থেকে। সে কারণেই তিনি তৎকালীন পার্টির নেতা ও গুরুবাদের বিরুদ্ধে ছিলেন। এরজন্য তাঁকে হাজারো বিরোধিতা সহ্য করতে হয়েছে নীরবে, উদ্দেশ্যে একাগ্র থেকে। মিডিয়ার দাক্ষিণ্যের লোভও ছিল না কিন্তু তাঁর বক্তব্যের বিকৃতিও আশা করেন নি মিডিয়ার দ্বারা। মার্কস, মাও কে তিনি কিন্তু মনে প্রাণে ভালবেসেছেন। তাঁর ভাবনা ও বক্তব্য বিষয় থেকে তা স্পষ্ট, - ''ব্যাপক অর্থে পলিটিক্স কথাটার মানে হল একটা দর্শন যা প্রত্যেকটা মানুষেরই আছে। তার জীবন-দর্শনই তার পলিটিক্স। আমরা সে ভাবেই নাটকটা করি। এখানে এমন কতগুলো মানুষ একত্রিত হয়েছি যারা বিশেষ কতগুলো বিশ্বাসে একমত হয়েছি। তাদের ব্যক্তিগত ভাবনার রাজনীতি এখানে যৌথ রাজনীতি হয়ে উঠেছে। সেই রাজনীতি থেকেই রাজনৈতিক নাটক করি। সেটা কোনও দলের ইলেকশান ম্যানিফেস্টার সঙ্গে নাও মিলতে পারে। একটা সময় ছিল যখন সি.পি.আই. ভাবছে, আমরা বোধহয় সি.পি.আই। কিছুদিন বাদে পরের নাটকটা দেখে বুঝল সি.পি.আই. নয়, তাহলে নিশ্চয়ই সি.পি.এম। সেও কিছুদিন পরে বুঝল আমরা সি.পি.এম. ও নই। তাহলে আমরা নকশাল। অবশেষে নকশালও কিছুদিন পরে বুঝল আমরা নকশালও নই। তাহলে আমরা কী? আমরা তাহলে রিঅ্যাকশনারী সি.আই.এ.-র এজেন্ট। এরকমই হয়েছে পরপর। সে কোন পার্টিই একটা ব্রান্ড না থাকলে সন্দেহ করে। আমাদের সম্পর্কে এটাই সন্দেহের। এখন আমি মার্ক্সিস্ট কথা বললে তারা আমাকে বলে আনমার্ক্সিস্ট। ইলেকশনে জিতেই তারা ধরে নিয়েছে বিপ্লবটা হয়ে গেছে আর এগোনোর দরকার নেই।''[৪] মাও-ৎসে-তুং বলেছিলেন আরও একশটা বিপ্লব লাগবে পৃথিবী পাল্টাতে। বাদল সরকার তাই থেমে থাকেন নি। আধুনিক সমাজের ভেতর দলাদলি, অন্তর্দ্বন্দ্ব, শোষণ, নিপীড়নে একা মানুষের লড়াইয়ে সাথ দিয়েছেন। খোলা জায়গায় অভিনয় মানেই তা মুক্তমঞ্চের নাটক, এমনটা নয়, তাতে থাকতে হবে অত্যাচারের বিরুদ্ধে সম্মুখ-সমরে সচেতনতা, আশু কর্তব্য ঠিক করে সাধারণ মানুষকে সঙ্গ দেওয়া। সফদর হাসমির কথায় - ''পথনাটক রাজনৈতিক দিক থেকে উগ্র প্রকৃতির হলেও শোষণ ও

অত্যাচারের বিরুদ্ধে এক সংগঠিত সাংস্কৃতিক প্রতিবাদ, যার মধ্যে তাৎক্ষণিক অথচ দূরপ্রসারী শক্তি থাকে।"[৫] সেই কাজই করছিলেন অঙ্গনমঞ্চ থেকেই (থিওসোফিক্যাল সোসাইটি, প্রজ্ঞানন্দ ভবন, সিন্ধি অ্যাসোসিয়েশন, লরেটো শিয়ালদা, প্রেসিডেন্সী কলেজের বেকার ল্যাবরেটরীর মাঠে), আর মুক্তমঞ্চে তাকে আগুনের মত ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন অনেক লোকের মাঝে। তিনি বলেছেন- ''আমাদের শপথ - জীবন ধারণের প্রয়োজনে যেটুকু সময় দিতে হয়, তার বাইরে সমস্ত সময়, সমস্ত শক্তি বৈপ্লবিক চেতনার প্রসারে এবং বিপ্লব ঘটানোর কাজে নিয়োগ করব, যতদিন বেঁচে আছি। ক্ষেত্র এবং পদ্ধতি আমরা নিজেরাই স্থির করব, নিজস্ব চিন্তায় ও যৌথ আলোচনায়। চেতনার ভিত্তিতে একত্রিত হব, অন্য সৎ মানুষদের একত্রিত করব, সচেতন কাজের ভিত্তিতে সংগঠিত হব।"[৬] তিনি এ সংগঠন নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন, আর বসে থাকলেন না দর্শকের জন্য। তাঁর নাটক পোর্টেবল ও ফ্লেক্সেবল হওয়ায় ইনএক্সপেনসেবল হয়ে উঠল। যেখানে খুশী দলই বহন করে নিয়ে যেতে পারে তাদের তাদের থিয়েটার অতি সহজে। রাতে, দিনে, শহরে কিংবা গ্রামে যেমন খুশী থিয়েটার করতে পারে যেমনটা তাদের সুবিধা। ফলে খরচ কমে গেল থিয়েটারে। টিকিট কাটতে না হওয়ায় অনেক অনেক মানুষ অংশ নিল থিয়েটারে, মানুষের মধ্যে মানুষের সুমানবিক সম্পর্ক তৈরি হতে থাকল যেমনটা চেয়েছিলেন বাদল সরকার। অভিনয়ের পরে যে পয়সা দিচ্ছে সাধারণ মানুষ সে সম্পর্কেও তাঁর একটা সূক্ষ্ম দর্শন কাজ করে। - ''যখন ফ্রি হয়ে গেল তখন দর্শক অভিনয়ের পরে যে পয়সাটা দিচ্ছে সেটা কিন্তু দামও নয়, দানও নয়। সেটা তাদের অংশগ্রহণ। সেইজন্য খুব গরীব জায়গাতে শো করলেও আমরা কিন্তু পয়সা তোলার চাদরটা ঘোরাই। তাদের কেন বঞ্চিত করব অংশগ্রহণ থেকে? তারা দশপয়সা দিক, পাঁচ পয়সা দিক, দেওয়ার সুযোগ পাক। এটা না করে জমিদারি সুলভ মনোভাবে যদি ভাবতাম তাদের পয়সা নেই, তাই পয়সা নেব না - তাহলেই কিন্তু ওদের ও আমাদের মধ্যে একটা স্তর বিভেদ চলে এল। ওরা নিম্নস্তর আমরা উচ্চস্তর।"[৭] যে স্তর তিনি ভাঙতেই থার্ড থিয়েটারে নেমেছিলেন।

তাঁর এই জ্বলন্ত বিষয় ভাবনাকে রূপ দিতে ও ছড়িয়ে দিতে আর কোথাও নয়, আমাদেরই বাংলাদেশের আদিপর্বের যাত্রা ও দ্বিতীয় পর্বের প্রসেনিয়াম মিশিয়েছেন। যুগীয় সংকট থেকেই বাংলা নাট্যের এই মিশ্র পর্ব বা ক্রম পর্ব বা নতুন পর্ব বা তৃতীয় থিয়েটার। নাট্য ব্যক্তিত্ব কুমার রায় বলেছেন - ''আমরা তো নাট্যকে আধুনিক প্রয়োজনে, দর্শকের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারি। আসবাব নির্ভর, আলো নির্ভর, প্রসেনিয়াম স্টেজের অন্তরাল নির্ভর অভিনয় একটা ভঙ্গীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই অভিনেতা যদি ফাঁকা মঞ্চে বা মুক্তমঞ্চে নিজের ওপর নির্ভর করে দাঁড়াতে পারে, চলতে শেখে - চারপাশের দর্শকের মাঝখানে - তাহলে সে অভিনেতা নিজের সর্বাঙ্গ দিয়েই অভিনয় করতে শিখবে। তার চলাফেরা দাঁড়ানো রূপময় হয়ে উঠবে। অভিনয়ে এ শিক্ষা আমরা কোথা থেকে পাবো যাত্রা ছাড়া।"[৮] তবে এ প্রসঙ্গে তাঁর একটি প্রশ্ন রয়েছে - ''প্রথাভাঙা থিয়েটারের পরিবর্তে 'প্রকৃত যাত্রা' এই স্লোগান নয় কেন?"[৯] নাট্যাচার্য শিশির কুমারও শেষদিকে যাত্রায় ফিরে যাওয়ার কথা বলেছিলেন। কিন্তু বাদলবাবু গ্রাম্য সংস্কৃতি ও শহুরে সংস্কৃতির সমন্বয় চেয়েছিলেন। কান থাকতেও যারা বধির পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদের কানে কথাটা পৌঁছে দিতে গেলে সমগ্র থিয়েটারকে হতে হবে আকর্ষণীয়, নতুন। এই সমন্বয়ই তাকে নতুন মাত্রা দেবে। যাত্রার আর পঞ্চাশ-ষাটের দশকের অব্যবসায়িক মানমর্যাদা নেই। প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মত যাত্রা করতেও বর্তমানে অনেক টাকা লাগে। যাত্রার স্টারেরা নিয়ে যায় অনেক টাকা। সে টাকা অতিসাধারণে দিতে পারে না অথচ সেইসব সাধারণ মানুষের কাছেই আধুনিক সমাজের সংকট বেশী করে পৌঁছানো প্রয়োজন। একটি বক্তব্যে বাদলবাবুর সে কথা স্পষ্ট হয়েছে- ''এটা একটা দর্শনের ব্যাপার, দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপার, যদি বলতে চান একটা রাজনীতির ব্যাপারও বলতে পারেন। কারণ এখানে যারা এই থিয়েটার করতে চাইছেন তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজটাকে বদলানো। অতএব তাঁরা বেশি বেশি লোকের কাছে যেতে চাইছে -ফ্রি থিয়েটার

করতে চাইছে।"[১০] সৌমেন্দু ঘোষ যেন বিষয়টিকে আরও একটু ব্যাখ্যা করে বলেছেন - ''কাগজে এঁরা বিজ্ঞাপন দেন না কারণ একটি দৈনিকের জন্য যে বিজ্ঞাপন খরচ তাও তো দর্শকের কাছ থেকে ওঠানো যাবে না। সাজসজ্জা নেই বললেই চলে, আলো একবার জ্বলে শেষে নেভে, আবহ সঙ্গীতের ব্যবহার মুখে শব্দ করে সেরে নেন। ঝর্ণা বোঝাতে অভিনেতারা ঝর্ণার ছন্দ এবং কলতানেই দর্শকদের ঝর্ণা বুঝিয়ে দেন। মুখে শব্দ সহ দুটি অভিনেতাকে সরিয়ে দিলে দরজা খোলা বলে মনে হয়, তাদের একটি হাতকে খিল হিসাবে ব্যবহার দর্শক মনকে কল্পনা প্রবণ করে তোলে।"[১১] অবস্থাবিপাকে বেশ সজীব সচল অভিনয় পদ্ধতি হয়ে উঠতে পারে, দর্শক যা ভাবতেও বিস্মিত হয়। তাছাড়া কবিগান, ছৌ, ঝুমুর, গম্ভীরা, ভাওয়াইয়া, মণিপুরী প্রভৃতি আঞ্চলিক নৃত্য-গীতের চমৎকৃত সমন্বয় ঘটেছে এই ক্রমপর্বে।

তাঁর এই থিয়েটারের কলা-কৌশল খানিকটা পরিস্থিতির দ্বারা কাকতালীয় সৃষ্ট। তবে কলা-কৌশল নিয়ে একটা বিদেশী আইডিয়া ছিল কিন্তু সচেতন বাস্তবায়নের চেষ্টা তখনও হয়নি। ২৪শে অক্টোবর, ১৯৭১ 'সাগিনা মাহাতো' নাটকটি অলবেঙ্গল টিচার্স এ্যাসোসিয়েশন হলে চলাকালীন যান্ত্রিক ত্রুটিতে হঠাৎ আলো নিভে গেল। নাটক থামল না, অন্ধকারেই চলল নাটক, সফলও হল। এরপর নাট্যপ্রযোজনায় আলোকসজ্জা বাদ দেওয়া হল, সাহসে ভর দিয়ে বাদ গেল রূপসজ্জা, মঞ্চসজ্জা প্রভৃতি। ক্লাসঘর। এতে প্রকৃতির সাহচর্যও পাওয়া গেল আর শিক্ষাও হয়ে উঠল সজীব। ঠিক তেমনি হলঘরের ভাড়া বেড়ে যাওয়ায় মঞ্চ নেমে এল দর্শকের মাঝে। ফলে অঙ্গনমঞ্চ হয়ে উঠল মুক্তমঞ্চ। মঞ্চসজ্জা, আলো, মেকআপ তো অঙ্গনমঞ্চেই বাদ পড়েছিল। হলঘরের ভাড়াও দিতে হল না বলে মুক্তমঞ্চের নাটক দেখতে টিকিট লাগল না। দর্শক হয়ে উঠল নাটকের অন্যতম অংশ। একি পরিস্থিতি সৃষ্ট নতুন ধরণ নয়!

আরও কত নতুন ধারণা নিয়ে এই মানুষটি বিপ্লবের আন্দোলনে নেমেছিলেন নাটক-অন্ত হয়ে যে তার নিমা-সীমা নেই। মানুষের জন্য তিনি অনেক ভেবেছেন। কোন নাট্যমশলা কেমন করে ব্যবহার করলে মানুষের বোধকে শানানো যাবে, আন্দোলনকে জয়যুক্ত করা যাবে ইত্যাদি। মোক্ষম শব্দ ব্যবহারে কৌশলী হয়ে উঠলেন। একই বাক্য বা শব্দগুচ্ছ পুনঃরুচ্চারণের সঙ্গে শারীরিক অভিব্যক্তি দ্বারা নতুন ভাষা তৈরির চেষ্টা করতে থাকলেন। সহ অভিনেতাদের পুতুল করে বসিয়ে রাখলেন না। তাঁরা নিজের নিজের মত করে বিষয়ের সঙ্গে একাত্মতার সুযোগ পেতে থাকল। নানা ভাব, শক্তিপুঞ্জ মঞ্চকে সার্থক করে তুলল আর তার সঙ্গে যুক্ত থাকল বাদল বাবুর টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউণ্ড। নাটক চলাকালীন তিনি দর্শককে বোধ, অনুশোচনা, কর্তব্যে আচ্ছন্ন করে দিতে চাননা বরং সজাগ মনকে আকর্ষিত করতে চান আর বাড়ি ফিরে চলুক চর্বনা। এও এক নতুন কৌশল। একই নাটক যখন গ্রামে কিংবা শহরে করেছেন তখন স্থান-পাত্র-মান ভিত্তিক ভাষা, উদাহরণ ও নানা উপাদান পাল্টে তাৎক্ষণিক প্রযোজনা করেছেন। তার বোধহয় প্রথম পরীক্ষা মূলক প্রয়োগ 'ভোমা' (১৯৭৫)। যেহেতু মঞ্চ মুক্ত, কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই তাই নাটকের ভাষা, সংলাপ, অবস্থান নাটকে যত না বলা থাকে রিহার্সালে বা ওয়ার্কশপে তা তৈরি করে নিতে হয় পরিস্থিতি মত। ১৯৭৪ সালে কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ডাইরেক্টর অফ প্ল্যানিং হয়ে কাজ করার সুবাদে গ্রাম ও গ্রাম্য পরিস্থিতি, ভূমি, ভূমিহীন ক্ষেতমজুর, গ্রামীণ ভাষা ইত্যাদি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা জন্মায়। এমনকি নাইজেরিয়া ফেরৎ (১৯৬৭, এপ্রিল) বেকার অবস্থায় রামচন্দ্রপুর, সিংজল, বনগাঁ অঞ্চল ঘুরে বেড়িয়েছেন। আর শহর, সে তো চেনা। অনেকগুলি দল তৈরি করেছিলেন তাদের মধ্যে 'শতাব্দী' অনন্য। ১৯৯৩-এ শতাব্দী, পথসেনা, আয়না এই তিনটি নাট্যদলের মিলিত কোরগ্রুপ হিসাবে গড়ে তোলেন 'শতক'। ছড়িয়ে দেন আন্দোলন বহুগুণ যেটি ব্রাজিলিয়ান নাট্যকার অগাস্তো বোয়ালের ভাবনার সঙ্গে মেলে। সেসব নাট্যদলের মাধ্যমে নিজের নাটক ছাড়াও অন্যের নাটক এবং বিভিন্ন লেখকের নানা গল্প উপন্যাসকে নাট্যরূপ দিয়ে

অভিনয় করালেন। সেসব গল্প, উপন্যাস, নাটক নির্বাচনে ছিল উদ্দেশ্য সচেতন দৃষ্টি। তাঁর কথায় - ''আমার কাছে যে নাটকের একটা সামাজিক গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা আছে সে নাটকটাই প্রযোজনা যোগ্য।''[১২] এ সকলের মূলে তাঁর একটাই চাওয়া মানুষের মনে আত্মশ্রদ্ধা জন্মাক, তাদের প্রাপ্যটা তারা বুঝে নিক, প্রাণশক্তিতে ভরে উঠুক তারা, এভাবেই থার্ড থিয়েটার কাজ করুক মানুষের মনে।

যদিও ইউজিনো বারবা 'থার্ড থিয়েটার' কথাটি ব্যবহার করে ফেলেছেন ITI Bulletin, Winter, 1977 সংখ্যায় প্রকাশিত 'The Third Theatre' প্রবন্ধে। বারবা ফার্স্ট থিয়েটার বলতে বাণিজ্যিক বা অনুদান প্রাপ্ত থিয়েটারকে বুঝিয়েছেন, সেকেণ্ড থিয়েটার হল তাঁর মতে পরিচালক প্রধান থিয়েটার আর থার্ড থিয়েটার দর্শকের নিজের থিয়েটার, নিজেদের সচেতন ভাবনা। দেশ-কাল-পরিস্থিতিগত দিক থেকে বারবার ফার্স্ট, সেকেণ্ড, থার্ড থিয়েটারের সঙ্গে বাংলার ফার্স্ট, সেকেণ্ড, থার্ড থিয়েটারের কোন মিল নেই। তবে বারবা থার্ড থিয়েটার বলতে যা বুঝিয়েছেন ঐ অর্থে খানিকটা বাদল সরকারও তাঁর নতুন থিয়েটারকে থার্ড থিয়েটার বলেছেন মাত্র। গেটোভস্কির Poor Theatre, রিচার্ড শেখনারের Environment Theatre, আমেরিকার জুলিয়ান বেক, জুডিথ ম্যালিনাদের Leaving Theatre, অগাস্তো বোয়ালের Oppressed Theatre, ব্রুস্টাইন কিংবা এই ইউজিনো বারবা-এর Third Theatre এগুলির কোনটির সঙ্গে মিল নেই যথেষ্ট বাদলবাবুর ভাবনার। নামে কোন ক্ষেত্রে আক্ষরিক মিল রয়েছে, ভাবে সামান্য। আঙ্গিকে মিল রয়েছে খানিক, বিষয়ে নেই। নাম ও আঙ্গিকের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ - বিষয় ও ভাব। গুরুত্বপূর্ণ- উদ্দেশ্য ভেদ করা ও নাট্যদর্শনকে সফল করা।

নাটকে আগ্রহ তো তাঁর একেবারে ছোট থেকেই কিন্তু নাট্যকার হয়ে ওঠার সক্রিয়তা সমাজ, রাজনীতি, পরিস্থিতি সাপেক্ষ। ১৯৫২-৫৩- তে প্রদীপ দত্তদের সঙ্গে এন্টালি নভিস আর্টিস্টস্ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন - 'এনাকা' তে যুক্ত ছিলেন কিছুটা উৎসাহ আর খেয়ালে। ১৯৫৩-১৯৫৪ - তে মাইথনে চাকরিতে গিয়ে সহকর্মী সন্তোষ ব্যানার্জী, জ্যোৎস্নাময় বসু, মুকুল রায়, রঞ্জিৎ ও অন্যান্যদের নিয়ে শুরু করেছিলেন 'মাইথন রিহার্সাল ক্লাব' কেবল অবসর সময় কাটানো ও ভালোচর্চায় যুক্ত থাকার জন্য। তারপরে তো বাদলবাবু লণ্ডনে পড়তে গেলেন টাউন প্ল্যানিংয়ে কেরিয়ার গড়তে। পড়তে-পড়তে চাকরিও করেছেন সেখানে। ১৯৫৮, লণ্ডনে 'Theatre in the round' দেখে ভাল থিয়েটার করার ইচ্ছে কয়েকগুণ হয়ে ওঠে বাদলবাবুর মনে। ফিরে এসে অর্থাৎ ১৯৬০-এ অঞ্জলি বোস, অজিত বোস, স্ত্রী-পুতুল, শ্যালিকা-মলিনা, প্রদীপ দত্ত, বিজন দাশগুপ্ত, শ্যামল চক্রবর্তী, সন্দীপ বোস, সুধীর রায়দের নিয়ে গড়লেন 'চক্র'। 'চক্র'- এরপর ১৯৬৭ - তে গড়লেন 'শতাব্দী'। থিয়েটারের এই নতুন মোড়ে সঙ্গে ছিলেন - দেবেন গঙ্গোপাধ্যায়, পঙ্কজ মুন্সী, হিমাংশু, অশোক, উৎপল, প্রবীর দত্ত আরো অনেকে। নাট্য বিষয়ে প্রত্যেক পদক্ষেপে প্রত্যেকেরই পরামর্শ পেয়েছেন বাদল সরকার। আর বিদেশে থাকাকালীন জোন লিটিল উড, চার্লস লটন, মিসেস লটন, মাইকেল রেডগ্রেভ, ভিভিয়েন লে, মার্গারেট রলিনস প্রভৃতি অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয় খুব কাছ থেকে দেখেছেন। 'টেস্ট অভ হানি' (শীলা ভোলেনি), 'হস্টেজ' (ব্রেনডান বেহান), 'ফ্রিডে' (রাসিন), 'দ্য পার্টি' - এর মত বেশকিছু নাটক দেখে খুব অনুপ্রেরণাও পেয়েছিলেন। গ্রেটোভস্কি, রিচার্ড শেখনারের মত বিখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্বদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল তাঁর। আমাদের দেশের নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ির নাটক দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর। রেডিওতে শুনেছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু লাহিড়ি, নরেশ মিত্র, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস ও অনেকের অভিনয়ের স্বরক্ষেপ। শিশিরবাবুর টিমওয়ার্ক নিয়ে পড়াশুনা করেছেন, পড়াশুনা করেছেন থিয়েটার সংক্রান্ত আরো অনেক বই। নাট্যদলগুলির মধ্য দিয়ে কত পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন। আবার দর্শকেরও প্রতিক্রিয়া ও মত নিয়েছেন সাদরে। সব নিয়ে নানা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। একেবারে

প্রথমের দিকে আনন্দবাজারে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন প্রকৃত থিয়েটার প্রেমী মানুষ পেতে। কিন্তু সবাই আর্থিক লেন-দেনটা বেশী বোঝেন। অথচ এই থিয়েটারের জন্য তিনি কত বেহিসাবী খরচ করেছেন, ক্ষতি স্বীকার করেছেন অনেক শো- তে। আবার টেকনিক্যাল গোলযোগে, হঠাৎ আলো নিভে যাওয়ায় শাপে বর হয়ে গেছে তাঁর নাট্য প্রযোজনায়। অনেক প্রতিবন্ধকতাও ছিল, সমালোচনাও হয়েছে তবু তাঁর সংস্কৃত বোধের প্রতিফলন ঘটেছে প্রতিটি নাট্য-অঙ্গে। নাটক লেখা, নাট্য পরিকল্পনা, মঞ্চ পরিকল্পনা, নাট্য প্রযোজনায় সদা উৎসাহী ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন নাট্য সাম্রাজ্যের অধীশ্বর বাদলবাবু কিন্তু সে পরিচয়ের ইতিহাস আজ খণ্ডিত মাত্র। তাঁর সুহৃদ শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে অসম্ভব নাট্যপাগল ও এনার্জেটিক দেখেছেন বলেই বলেছেন - ''কাজটা এমনই অভিজ্ঞতা নির্ভর তথা অভিজ্ঞতা জারিত যে কাজটার বাইরে বেরিয়ে এসে আনুষ্ঠানিক ভাষণে বা প্রবন্ধে বাদলবাবু যে-কবার তাঁর থিয়েটারকে তত্ত্বভাবনার কাঠামোয় ধরতে গেছেন, তাতে তার স্বাদ বা যথার্থ চরিত্র ধরা পড়েনি। তবু আশা ছিল যে, আত্মজীবনীমালায় সে অভিজ্ঞতা পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় ওই থিয়েটারের স্বধর্ম পরিস্ফুট করবে। বাদলবাবুর উদাসীনতায় আমার প্রায় বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণা হয়।''[১৩] যদিও বাদলবাবুর এই উদাসীন সব লেখা, নানা সাক্ষাৎকার, তাঁর প্রযোজনা, তাঁর সংস্পর্শে থাকা বহু গুণীজনের স্মৃতি-সত্ত্বা, উত্তরাধিকারী নানা মঞ্চ সব মিলেমিশে কোন গবেষণা কাজ, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়দের যন্ত্রণায় কিছুটা স্বান্ত্বনা।

তথ্যসূত্র :

১. গৌতম সেনগুপ্ত (সম্পাদনা) - ঋতম (সাময়িক পত্র) - ভিন্নপ্রথার থিয়েটার : একটি প্রশ্ন, কুমার রায়, প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৭৯ - পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭

২. ঋতদীপ ঘোষ (সম্পাদিত) - নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ বাদল সরকার- একটি সাক্ষাৎকার - নাট্যচিন্তা - ১০ বি, ক্লিক লেন, কোলকাতা ১৪ জানুয়ারী ২০১৪- পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৩

৩. ঋতদীপ ঘোষ (সম্পাদিত) - নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ বাদল সরকার- একটি সাক্ষাৎকার - নাট্যচিন্তা - ১০ বি, ক্লিক লেন, কোলকাতা ১৪ জানুয়ারী ২০১৪- পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০২

৪. ঋতদীপ ঘোষ (সম্পাদিত) - নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ বাদল সরকার- একটি সাক্ষাৎকার - নাট্যচিন্তা - ১০ বি, ক্লিক লেন, কোলকাতা ১৪ জানুয়ারী ২০১৪- পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০২

৫. পার্থপ্রতিম মিত্র, জয়ন্ত মৌলিক সম্পাদিত - অন্বীক্ষা (সাময়িক পত্রিকা) - পথনাটক একটি পৃথক ঐতিহ্য সফদর হাসমি।

৬. ঋতদীপ ঘোষ (সম্পাদিত) - নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ বাদল সরকার- একটি সাক্ষাৎকার - নাট্যচিন্তা - ১০ বি, ক্লিক লেন, কোলকাতা ১৪ জানুয়ারী ২০১৪- পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৫

৭. ঋতদীপ ঘোষ (সম্পাদিত) - নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ বাদল সরকার- একটি সাক্ষাৎকার - নাট্যচিন্তা - ১০ বি, ক্লিক লেন, কোলকাতা ১৪ জানুয়ারী ২০১৪- পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৪

৮. গৌতম সেনগুপ্ত (সম্পাদনা) - ঋতম (সাময়িক পত্র) - ভিন্নপ্রথার থিয়েটার : একটি প্রশ্ন, কুমার রায়, প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৭৯ - পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭

৯. গৌতম সেনগুপ্ত (সম্পাদনা) - ঋতম (সাময়িক পত্র) - ভিন্নপ্রথার থিয়েটার : একটি প্রশ্ন, কুমার রায়, প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৭৯ - পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭

১০. গৌতম সেনগুপ্ত (সম্পাদনা) - ঋতম (সাময়িক পত্র) - ভিন্নপ্রথার থিয়েটার : একটি প্রশ্ন, কুমার রায়, প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা,

অক্টোবর, ১৯৭৯ - পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪

১১. গৌতম সেনগুপ্ত (সম্পাদনা) - ঋতম (সাময়িক পত্র) - ভিন্নপ্রথার থিয়েটার : একটি তীব্র শিল্প মাধ্যম, সৌমেন্দু ঘোষ, প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৭৯ - পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭

১২. ঋতদীপ ঘোষ (সম্পাদিত) - নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ বাদল সরকার- একটি সাক্ষাৎকার - নাট্যচিন্তা - ১০ বি, ক্লিক লেন, কোলকাতা ১৪ জানুয়ারী ২০১৪- পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২১

১৩. শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) - বাদল সরকার : এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার - থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জী রোড, কলকাতা-২৬- ২০১৭, পৃ.সংখ্যা - ৮

সহায়ক গ্রন্থ :

১. ঋতদীপ ঘোষ (সম্পাদিত) - নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ বাদল সরকার- একটি সাক্ষাৎকার - নাট্যচিন্তা - ১০ বি, ক্লিক লেন, কোলকাতা ১৪ জানুয়ারী ২০১৪

২. দর্শন চৌধুরী - বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস-পুস্তক বিপনি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, নভেম্বর - ২০১৬

৩. দর্শন চৌধুরী - নাট্য ব্যক্তিত্ব বাদল সরকার - একুশ শতক - ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা- ৭৩, ২০১৬

৪. ড. শেখর সমাদ্দার - বাংলার নাট্য সংস্কৃতির ইতিহাস - প্রয়াগ প্রকাশনী, রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা -৪৯ - জানুয়ারী ২০১০

৫. শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) - বাদল সরকার : এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে থার্ড থিয়েটার - থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জী রোড, কলকাতা-২৬- ২০১৭

৬. সুনীল দত্ত - নাট্য আন্দোলনে তিরিশ বছর

সহায়ক পত্র পত্রিকা:

১. গৌতম সেনগুপ্ত - ঋতম, প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, জুলাই ১৯৭৯
প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৭৯
দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৯৮০
তৃতীয় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, ১৯৮১
সপ্তম বর্ষ, চোদ্দতম সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৮৫

২. পার্থপ্রতীম মিত্র, জয়ন্ত মৌলিক - অন্বীক্ষা

৩. সাগ্নিক, প্রথম বর্ষ, তৃতীয় - চতুর্থ সংখ্যা, জুলাই, ডিসেম্বর ১৯৯৯